অতীত ও ঐতিহ্য

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত সপ্তমশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯– এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্রও প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী অতীত এবং ঐতিহ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা সারণির ব্যবহারও করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, প্যঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম 'অতীত ও ঐতিহ্য'। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের বইটি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক কয়েকটি ধারণাকেও একটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পচ্ছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী-- 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো। সেগুলির মাধ্যমে হাতেকলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

উত্তরা চক্রবর্তী
সৈয়দ আবিদ আলী
প্রবাল বাগচী
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তিস্তা দাস
সোমদত্তা চক্রবর্তী
কাশ্‌শফ গনি
অনির্বাণ মণ্ডল
প্রত্যয় নাথ
পরমা মাইতি

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল

অনুপম দত্ত

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইতিহাসের ধারণা	১
২.	ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	৭
৩.	ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৫
৪.	দিল্লি সুলতানি : তুর্কো-আফগান শাসন	৪৩
৫.	মুঘল সাম্রাজ্য	৬৯
৬.	নগর, বণিক ও বাণিজ্য	৯৯
৭.	জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি : সুলতানি ও মুঘল যুগ	১১৩
৮.	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	১৫৯
৯.	আজকের ভারত : সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন	১৬৭
	শিখন পরামর্শ	১৭৩

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

১.১ ইতিহাসের গল্প-সল্প

যত পুরোনো দিনের কথাই হোক, গল্পের মতো করে বললে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু মুশকিল হলো অনেক ইতিহাস বইতেই গল্পগুলি ভালো জমে না। খালি রাজা-উজিরের নাম-ধাম, যুদ্ধের সাল-তারিখ। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে গল্পের মতো সেই মজাটা সবাই পায় না। গুলিয়ে যায় নামগুলি। মনে থাকে না সাল-তারিখ। কে কার পরে ক্ষমতায় এলেন—সেসব মনে রাখা খুবই কঠিন!

কিন্তু কঠিন হলেও একটু আধটু নাম বা সাল মনে রাখা জরুরি। কারণ, যে সব ঘটনার কথা ইতিহাস বইতে থাকে, সেগুলি আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগে ঘটেছিল। আবার সব ঘটনাগুলি একই দিনে বা একই বছরে ঘটেনি। তাহলে কীভাবে জানা যাবে কোন ঘটনাটা কবে ঘটেছিল? তাই আগে-পরে করেই সাজাতে হয় ইতিহাসকে। তার জন্য জানতে হবে ঘটনাগুলির সময়কাল। ইতিহাসে সময় মাপতে গেলে চাই তারিখ, মাস, সাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ—এইসব নানা সময় মাপার হিসাব। সেখানে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার হিসাব বিশেষ কাজেই লাগে না! তাই সাল-তারিখগুলি যতই জটিল হোক, আসলে ওরা নির্দোষ। পাছে আমরা সময়ের হিসাবে গোলমাল করে ফেলি, তাইতো ওরা আমাদের সাবধান করে দেয়। ফলে ইতিহাস বইতে একটু-আধটু সাল-তারিখ থাকবেই। নানান ধাঁধা বা মজার হিসাব করে সাল-তারিখ মনে রাখাটা একটা খেলা। দেখোতো, কত ভালো করে তোমরা এই খেলাটা খেলতে পারো বছর জুড়ে।

জটিল নাম-ধামগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা তবু থেকেই গেলো। কারো যদি নামের আগে 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' বা 'সকলোত্তরপথনাথ'-এর মতো উপাধি বসে! কারো যদি নাম হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি! এসব নাম বা উপাধি মনে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু এই উপাধি বা নামগুলি অনেক কাল আগের মানুষদের। তাঁরাও হয়তো এতো বড়ো বড়ো নাম-উপাধি নিয়ে গোলমালে পড়তেন। কিন্তু উপায় ছিল না। ঐ সময় এমন বড়ো খটোমটো উপাধি এবং নামেরই চলন ছিল। সেই নামগুলি এখন আর বদলে নেওয়ার উপায় নেই। বাবর, আকবর প্রভৃতি নামগুলি বেশ ছোটো, সহজেই মনে থাকে।

"বাবার হইল আবার জ্বর
সারিল ঔষধে"— এই বাক্যটায় ছ-জন মুঘল সম্রাটের নামের হদিশ লুকিয়ে আছে। দেখোতো নামগুলি খুঁজে পাও কিনা? সূত্র লুকিয়ে আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

কিন্তু যতোই শক্ত লাগুক, দন্তিদুর্গ নামের কাউকে-তো আর ছোটো করে দন্তি বা দুর্গ বলে লেখা যায় না!

কিন্তু ধরা যাক তোমাদের কারো কারো বেশ মনে থাকে সব নাম বা সাল। ইতিহাস বুঝতে পারা কি তাকেই বলে? সোজা কথায় এর উত্তর হলো— না। সাল-তারিখ নাম-ধাম মুখস্থ থাকলেই ইতিহাস জানা হয় না। তাহলে ইতিহাস জানা কাকে বলে? ছোটো করে বললে বলা যায়, বছরের পর বছর ঘটা নানান ঘটনার এবং অনেক লোকের অনেক কাজকর্মের কারণ এবং ফলাফল বোঝার চেষ্টা করাই ইতিহাস জানা। এমন অনেক ঘটনা এবং কাজ আগে ঘটেছে, যার ছাপ আজও আমাদের চারপাশে রয়েছে। তাই সেই সব কাজ এবং ঘটনাগুলো বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। সেই ধারণা তৈরির জন্যই ইতিহাস পড়ার দরকার হয়।

টুকরো কথা

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাসের সব উপাদান একরকম নয়। একটি পুরোনো মূর্তি, পুরোনো মুদ্রা বা পুরোনো বই এক জিনিস নয়। তাই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন--- লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লিখিত উপাদান। পাথর বা ধাতুর পাতে লেখা থেকে পুরোনো দিনের অনেক কথা জানা যায়। সেগুলিকে বলে লেখ। তামার পাতে লেখা হলে তা হয় তাম্রলেখ। আবার পাথরের উপর লেখা হলে তা হয় শিলালেখ। আর কাগজে লেখাগুলিকে বলা হয় লিখিত উপাদান।

১.২ ইতিহাস জানার রকমফের

পুরোনো দিনের যেসব জিনিস আজও রয়ে গেছে সেগুলোই অতীতের কথা জানতে সাহায্য করে। পুরোনো ঘর-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ, মূর্তি, টাকা-পয়সা, আঁকা ছবি, বইপত্র থেকে এক একটা সময়ের মানুষের বিষয়ে আমরা জানতে পারি। তাই সেগুলি ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতির কোপে আর মানুষের হাতে পড়ে সেসব উপাদানের অনেক কিছুই আজ আর নেই। তাই একটানা ইতিহাস জানার উপায়ও নেই। ভাঙাচোরা, ছিঁড়ে যাওয়া উপাদানের টুকরো খুঁজে জুড়ে নেন ঐতিহাসিক। তারপর সেগুলিকে সাজিয়ে নেন আগে পরে করে। তার থেকে তৈরি করেন অনেক আগের সেই সময়ের একটা ছবি। আর যেখানে উপাদানের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

টুকরো উপাদান দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক ভরাট করার সময় ঐতিহাসিককে সাবধান থাকতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে ঠিক টুকরো ঠিক সময়ে খাপ খায়। সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায় কথার মানে। সেটা ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হয়। আজকাল তোমরা 'বিদেশি' বলতে ভারতের বাইরে অন্য দেশের লোকেদের বোঝো। কিন্তু সুলতানি বা মুঘল যুগে 'বিদেশি' বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে কোনো লোককেই বোঝাতো। তাই শহর থেকে অচেনা কেউ গ্রামে গেলে তাকেও ঐ গ্রামবাসীরা 'পরদেশি' বা 'অজনবি' ভাবতেন। ফলে মুঘল যুগের কোনো লেখায় 'পরদেশি' কথাটা দিয়ে সবসময় ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক বোঝাতো না, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আবার ধরো, 'দেশ' বলতে অনেকেই

তাঁদের আদি বাড়ি বোঝেন। যেমন, কেউ হয়তো বলেন— তাঁর দেশ বর্ধমান। এখানে 'দেশ' আসলে একই রাজ্যের মধ্যে আলাদা অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। কারণ বর্ধমান জায়গাটি ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশ নয়। সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা মাত্র। তাহলে দেখো সুলতানি বা মুঘল আমলে কিংবা আজকের দিনেও 'দেশ' কথাটার কতো রকম ব্যবহার হয়। যখনই ইতিহাস পড়বে তখন আগে বুঝে নেবে কোন সময়ে কোন অঞ্চলের কথা সেখানে বলা হচ্ছে।

এই বইতে প্রায় হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস তোমরা জানবে। মোটামুটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সপ্তদশ শতক পেরিয়ে অষ্টাদশ শতকের দোরগোড়া পর্যন্ত এই হাজার বছরে ভারতবর্ষে অনেক কিছু বদল ঘটেছে। আবার কিছু কিছু বিষয়ে মিল রয়ে গেছে। তবে কোনো বদলই রাতারাতি ঘটেনি। এখানে সেই ধারাবাহিক বদলগুলির নানা কথাই বলা হয়েছে।

টুকরো কথা

হিন্দ, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া

*খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অবশ্য এদেশে আসেননি। তিনি পারসিক লেখাপত্র থেকে ভারত সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকা কিছুদিনের জন্য পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন এই অঞ্চলের নাম হয় 'হিদুষ'। ইরানি ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ নেই। তাই 'স' বদলে গিয়ে হয়েছিল 'হ'। ফলে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলগুলি হিদুষ নামে পরিচিত হলো। আবার গ্রিক ভাষায় 'হ' এর উচ্চারণ নেই। তার বিকল্প 'ই'। অতএব যা ছিল সিন্ধু-হিদুষ, তা গ্রিক বিবরণে অনেকটা বদলে গিয়ে 'ইন্ডিয়া' হলো। তবে খেয়াল রেখো, সেইসময় ইন্ডিয়া শব্দটি সিন্ধু ব-দ্বীপ এলাকাকেই মূলত বোঝাত। পরবর্তী সময়ে গ্রিকদের বিবরণী পড়লে বোঝা যায় পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া বলতে উপমহাদেশকেই বোঝানো হয়েছে। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র —এই প্রধান দুই সীমানা সম্পর্কে গ্রিক লেখকরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিদেশি তথ্যসূত্রে আরেকটি নাম পাওয়া যায়— 'হিন্দুস্তান'। আরবি-ফারসি ভাষায় হিন্দুস্তানের কথা বারবার এসেছে। ২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের একটি শিলালেখতে হিন্দুস্তান শব্দটি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও সিন্ধু নদী সংলগ্ন অঞ্চলকেই হিন্দুস্তান হিসাবে বোঝানো হয়েছে। দশম শতকের শেষভাগে অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত **হুদুদ অল্ আলম** গ্রন্থে 'হিন্দুস্তান' শব্দ দ্বারা সমগ্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে।*

১.৩ ইতিহাসের গুণ-ভাগ

একটি দিনকে আমরা ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করতে পারি। কিন্তু হাজার হাজার বছরকে ভাগ করার উপায় কী? ঐতিহাসিকরা তাই 'যুগ' দিয়ে আলাদা করেন লম্বা সময়কালকে। সাধারণভাবে 'প্রাচীন', 'মধ্য' ও 'আধুনিক'— এই তিন যুগে ইতিহাসের সময়কে ভাগ করা হয়। সেই অর্থে যে হাজার বছরের কথা এখানে আলোচনা করা হবে, সেটা মধ্যযুগে পড়ে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এভাবে যুগের পাঁচিল তুলে ইতিহাসকে ভাগ করা যায় না। হঠাৎ করে কোনো এক দিন সকাল থেকে একটি যুগ শেষ হয়ে আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায় না।

তাহলে কীভাবে বোঝা যায় কোন সময়টি কোন যুগে পড়বে? আসলে মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দেশশাসন, যুদ্ধ, পড়াশোনা— এসব কাজের এক একটি বিশেষ দিক এক এক সময়ে দেখা যায়। সেগুলির তফাত থেকেই যুগ ভাগ করা রেওয়াজ আছে। তাহলে কেমন ছিল মধ্যযুগের ভারত? আগে অনেকে বলতেন, সেসময়ে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল মানুষের জীবন। কোনো কিছুতেই নাকি কোনো উন্নতি হয়নি। তবে আজকাল আর সেকথা মানা হয় না। টুকরো টুকরো উপাদান জুড়ে ঐতিহাসিকরা সেসময়ের ইতিহাস লিখেছেন। তাতে দেখা যায়, তখন জীবনের নানান দিকে অনেক কিছুরই উন্নতি করেছিল ভারতের মানুষ। এই বইতে সেসব উন্নতির কথাও তোমরা জানতে পারবে।

এক দিকে ছিল নানান নতুন যন্ত্র ও কৌশলের ব্যবহার। কুয়ো থেকে জল তোলা, তাঁত বোনা বা যুদ্ধের অস্ত্র— বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছিল অনেক কিছুই। অনেক নতুন খাবার ও পানীয়ের কথা এই সময় জানতে পারে ভারতের লোক। এর সবচেয়ে মজার উদাহরণ হলো রান্নায় আলুর ব্যবহার। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এদেশে আলু খাওয়ার চল শুরু হয়।

দেশ শাসনে আর রাজনীতিতেও নতুন অনেক দিক দেখা গিয়েছিল। শুধু রাজ্য বিস্তার নয়, জনগণের ভালো-মন্দের কথাও শাসকদের ভাবতে হয়েছিল। কখনও রাজার শাসন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আবার কখনও সব ক্ষমতা একজন শাসকই হাতে তুলে নিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে একদিকে ছিল কৃষি, অন্যদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্য। তৈরি হয়েছিল নতুন নতুন শহর। বন কেটে চাষবাস করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধর্মভাবনায় বেশ কিছু নতুন পথের হদিশ সেসময়ের মানুষ পেয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়ার কথা বলা

টুকরো কথা

আদি-মধ্যযুগ

রাতারাতি ইতিহাসের যুগ বদলে যায় না। ধরো দুপুরবেলার কথা। সেটা না সকাল না বিকেল। তেমনই ভারতের ইতিহাসে একটা বড়ো সময় ছিলো, যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগও পুরোপুরি শুরু হয়নি। ঐতিহাসিকরা সেই সময়টিকে বলেন আদি- মধ্যযুগ।

হয়েছিল। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাই হয়ে উঠেছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম। তার ফলে ভারতের নানান অঞ্চলে আঞ্চলিক অনেক ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ হয়। পাশাপাশি ছিল নানা ধরনের শিল্পচর্চা।

কিন্তু শিল্প হোক বা সাহিত্য— সবেতেই সাধারণ গরিব মানুষের কথা খুব বেশি ছিল না। সেসবের বেশির ভাগই ছিল শাসকের গুণগানে ভরা। সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকতো শাসকের নাম। তাই বলা হয়— চোল রাজারা মন্দির বানিয়েছেন। অথবা তাজমহল বানিয়েছেন সম্রাট শাহজাহান। অসংখ্য সাধারণ কারিগর এবং শিল্পী যারা মন্দিরগুলি এবং তাজমহল বানালেন, তাঁদের বেশির ভাগের নাম আমরা জানি না।

১.৪ ইতিহাসের গোয়েন্দা

ইতিহাস বই পড়তে সবসময় ভালো না লাগলেও, গোয়েন্দা গল্প পড়তে তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগে। আসলে ঐতিহাসিকও একজন গোয়েন্দা। গল্পের গোয়েন্দা টুকরো টুকরো সূত্র (Clue/ক্লু) খুঁজে বের করেন। তারপর যুক্তি দিয়ে সূত্রগুলির ঠিক-ভুল বিচার করেন। শেষে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা তুলে ধরেন। তেমনি ঐতিহাসিকও টুকরো টুকরো সূত্র খোঁজেন। সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। তারপরে সূত্রগুলি সাজিয়ে অনেককাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা সময়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর যেখানে সূত্রের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

গোটা বছর জুড়ে এই বইটি পড়ার সময়ে তোমরাও এক এক জন ঐতিহাসিক বা গোয়েন্দা হয়ে ওঠো। খুঁটিয়ে দেখো সূত্রগুলি। অনেক জায়গায় ফাঁক আছে। চেষ্টা করো যুক্তি দিয়ে সেগুলির ভরাট করার। খুঁজে দেখো নতুন কোনো সূত্র পাও কি না। তাহলে দেখবে ইতিহাস পড়তে গিয়ে তোমরা এক একজন ইতিহাসের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছো। তখন ইতিহাস পড়তে আরো ভালো লাগবে।

ভেবে বলোতো ইতিহাসে অনেক সময়েই কেন সাধারণ মানুষ বা কারিগর ও শিল্পীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না?

তোমার পাতা

ইতিহাসের গোয়েন্দা হিসাবে হাত পাকানোর জন্য সামনের আটটি অধ্যায় রইল। ঐ আটটি অধ্যায়ে যা যা সূত্র পাবে সেসব এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর জুড়ে .....

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

আমরা ভারতের অধিবাসী। ভারতের যে অংশে আমরা থাকি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এই নামটি বেশি দিনের পুরোনো নয়। এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব এই জায়গাটি অনেক কাল আগে কী নামে পরিচিত ছিল, এর ভৌগোলিক সীমানা কী ছিল, এর বিভাগগুলি কী ছিল, কারা এখানে শাসন করতেন, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি। এর জন্য আমরা ফিরে যাব অনেক কাল আগের কথায়। সে সময় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন আজকের তুলনায় অনেক আলাদা ছিল।

২.১ প্রাচীন বাংলা

প্রথমে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে জানব। এখানে মনে রাখতে হবে যে এসব হলো এক-দেড় হাজার বছরেরও বেশি আগেকার কথা। এই ভৌগোলিক বিভাগগুলির সীমানা সব সময় এক থাকেনি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা নানান সময়ে আলাদা-আলাদা ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

টুকরো কথা

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটিকে বোঝানো হতো তা ভৌগোলিকভাবে খুব বড়ো কোনো এলাকা ছিল না। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বঙ্গ ছিল একটি বিভাগ মাত্র। মহাভারতে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদিকে একেকটি আলাদা রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যেও বঙ্গ ও সুহ্ম নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজের লেখাতেও বঙ্গ রাজ্যের কথা আছে। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি গ্রন্থে এই অঞ্চলকে ***সুবা বাংলা*** *বলে উল্লেখ করেছেন। সুবা মানে প্রদেশ বা রাজ্য।*

*ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এখানে এসেছিলেন। তাঁরা এই দেশের নাম দিয়েছিলেন **বেঙ্গালা**। স্বাধীনতার আগে এই বিরাট ভূখণ্ড **বাংলা** বা **বাংলাদেশ** বা **বেঙ্গল** নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের সময় বাংলার পশ্চিম ভাগের নাম হলো **পশ্চিমবঙ্গ**। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। ঐ সময় পূর্ব বাংলা চলে গেল নতুন দেশ পাকিস্তানে। পরে তার নাম হলো **পূর্ব পাকিস্তান**। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হলো। তার নতুন নাম হলো **বাংলাদেশ**।*

এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র নাও। এখন পশ্চিমবঙ্গে ক-টি জেলা? কোন জেলায় তোমার বাড়ি? সেই জেলাটি ২.১ মানচিত্রের কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

প্রাচীন বাংলার সীমানা প্রধানত তিনটি নদী দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই নদীগুলি হলো ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা (***২.১ মানচিত্র দেখো***)। বাংলার একেকটি অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ছিল। আবার, কয়েকটি অঞ্চল অন্য কোনো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা রাজ্যবিস্তার করতেন তখন সেই অঞ্চলের সীমানাও বদলে যেত।

প্রাচীন বাংলার প্রধান অঞ্চলগুলি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, সমতট ও হরিকেল। সাধারণভাবে কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের নাম অনুসারে জায়গার নাম হতো। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি নামগুলি এক একটি জনগোষ্ঠীর নাম। তারা যে অঞ্চলে থাকত, সেই অঞ্চলটির নাম হতো তাদের নাম অনুযায়ী।

পুণ্ড্রবর্ধন : পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহি এবং পাবনা জুড়ে ছিল। এক সময় শ্রীহট্টও (সিলেট) এর ভিতরে ছিল। গুপ্ত যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি *ভুক্তি* বা শাসন-এলাকা।

বরেন্দ্র : ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মধ্যের এলাকা বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ : প্রাচীন কালে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মাঝে ত্রিভুজের মতো দেখতে ব-দ্বীপ এলাকাকে বঙ্গ বলা হতো। সম্ভবত ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের এলাকাও এর মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে রাঢ় এবং সুহ্ম নামে দুটো আলাদা অঞ্চলের উৎপত্তি ঘটলে বঙ্গের সীমানাও বদলে যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে বঙ্গ বলতে এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুর, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলকে বোঝানো হতো।

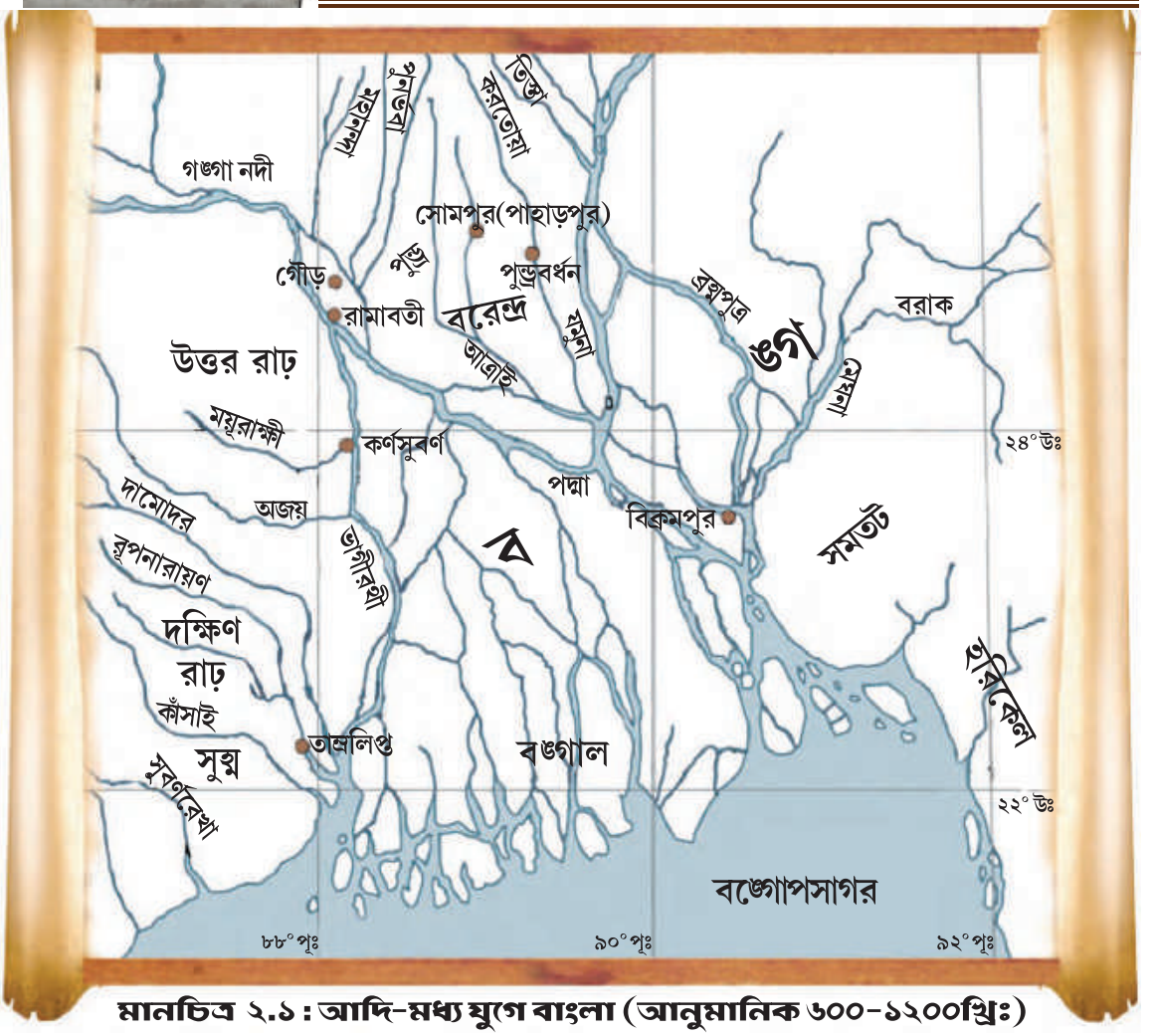

মানচিত্র ২.১ : আদি-মধ্য যুগে বাংলা (আনুমানিক ৩০০-১২০০খ্রিঃ)

বঙ্গাল : বঙ্গাল অঞ্চল বলতে বঙ্গের দক্ষিণ সীমানাবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপকূলকে চিহ্নিত করা হতো।

রাঢ়-সুহ্ম : প্রাচীন রাঢ় বা লাঢ় অঞ্চলের দুটি ভাগ ছিল। উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়। জৈনদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে উত্তর রাঢ় ছিল বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) এবং দক্ষিণ রাঢ় ছিল সুব্ভভূমি (সুহ্মভূমি) এলাকা। উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়ের মাঝের সীমানা ছিল অজয় নদ। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম ভাগ, বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনার একাংশ এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তর ভাগ ছিল উত্তর রাঢ় অঞ্চল। দক্ষিণ রাঢ় বলতে আজকের হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান জেলার বাকি অংশ এবং অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিরাট এলাকাকে বোঝানো হতো। দক্ষিণ রাঢ় ছিল বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা। মহাভারতের গল্পে এবং কালিদাসের কাব্যে আছে যে ভাগীরথী এবং কাঁসাই (কংসাবতী) নদীর মাঝে সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট এলাকা এর অন্তর্গত ছিল।

রাঢ় অঞ্চল বলতে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলকে বোঝায়? সেই অঞ্চলে কী কী নদী আজও আছে?

গৌড় : প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলায় গৌড় ছিল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গৌড় বলতে একটি জনগোষ্ঠীকেও বোঝানো হতো। বরাহমিহিরের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) রচনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেকালের গৌড়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের সীমা বেড়ে গিয়েছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে আজকের মুর্শিদাবাদ জেলাই ছিল সেকালের গৌড়ের প্রধান এলাকা। শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত এলাকা গৌড়ের অন্তর্গত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে গৌড় বলতে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যকেও বোঝানো হতো।

সমতট : প্রাচীন সমতট ছিল মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের সমভূমিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন সমতট অঞ্চল। মেঘনা নদী সমতটকে বাংলার বাকি অঞ্চলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। এই কারণে সমতটকে প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা বলে ধরা হতো।

হরিকেল : সমতটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আজকের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল প্রাচীন যুগে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল।

এবারে আসা যাক বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা শশাঙ্কের কথায়।

২.২ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক ছিলেন এক গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত। ৬০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু কাল আগে তিনি গৌড়ের শাসক হন। শশাঙ্কের শাসনের ষাট-সত্তর বছর আগে থেকেই গৌড় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের ক্ষমতা আরও বেড়েছিল। ৬৩৭-'৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

শশাঙ্কের শাসনকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি (মালব, কনৌজ, স্থানীশ্বর বা থানেসর, কামরূপ, গৌড় প্রভৃতি) নিজ-নিজ স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখত। শশাঙ্ক সেই দ্বন্দ্বে অংশ নেন। সেভাবে উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। শশাঙ্ক সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং ওড়িশার একাংশ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতের ক্ষমতাধর রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াই করে শশাঙ্ক গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

টুকরো কথা

কর্ণসুবর্ণ : প্রাচীন বাংলার নগর

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) রেলস্টেশনের কাছে রাজবাড়িডাঙায় প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চিনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। এর কাছেই ছিল সেকালের গৌড়ের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণ। চিনা ভাষায় এই বৌদ্ধবিহারের নাম ***লো-টো-মো-চিহ্।*** *সুয়ান জাং তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) থেকে এখানে এসেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ স্থানীয় ভাবে রাজা কর্ণের প্রাসাদ নামে পরিচিত।*

সুয়ান জাং লিখেছেন যে, এই দেশটি জনবহুল এবং এখানকার মানুষেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে জমি নীচু ও আর্দ্র, নিয়মিত কৃষিকাজ হয়, অঢেল ফুল-ফল পাওয়া যায়, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং এখানকার মানুষজনের চরিত্র ভালো ও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ এবং শৈব উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করত।

কর্ণসুবর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এখানকার নাগরিকদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসত। শশাঙ্কের আমলের অনেক আগে থেকেই সম্ভবত এই অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। রক্তমৃত্তিকা থেকে জনৈক বণিক জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এর থেকে কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কর্ণসুবর্ণের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটেছে বারবার। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এই শহর অল্প সময়ের জন্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার হাতে চলে যায়। এর পর কিছু কাল এটি জয়নাগের রাজধানী ছিল। তবে সপ্তম শতকের পরে এই শহরের কথা আর বিশেষ জানা যায় না। পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিতে এর কোনো উল্লেখ নেই।

ছবি : ২.১ রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, কর্ণসুবর্ণ, পশ্চিমবঙ্গ

শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থানীশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় শাসক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। *সকলোত্তরপথনাথ* উপাধিধারী হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে হারাতে পারেননি।

শশাঙ্ক ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন শৈব বা শিবের উপাসক। *আর্যমঞ্জু শ্রীমূলকল্প* নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং *সুয়ান জাং*-এর ভ্রমণ বিবরণীতে তাঁকে 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' বলা হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হত্যা করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্মারক ধ্বংস করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচনা *হর্ষচরিত*-এ শশাঙ্ককে নিন্দা করা হয়েছে।

অন্যদিকে শশাঙ্কের শাসনকালের কয়েক বছর পরে *সুয়ান জাং* কর্ণসুবর্ণ নগরের উপকণ্ঠে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ৎসিঙ্-এরও নজরে পড়েছিল বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি। শশাঙ্ক নির্বিচারে বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে তা হতো না। বলা যায় যে, শশাঙ্কের প্রতি সব লেখকরা পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁদের মতামত কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শশাঙ্কের শাসনকালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে বলা যায় *গৌড়তন্ত্র*। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের কর্মচারী বা আমলারা একটা নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী গড়ে তুলেছিল। আগে যা ছিল গ্রামের স্থানীয় লোকের কাজ, শশাঙ্কের সময় সেই কাজে প্রশাসনও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। অর্থাৎ, ঐ আমলের গৌড় রাজ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার পরিচালনা করা হতো।

শশাঙ্কের আমলে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল (***২.২ ছবি দেখো***)। কিন্তু তার মান পড়ে গিয়েছিল। নকল সোনার মুদ্রাও দেখা যেত। রুপোর মুদ্রা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যুগে সম্ভবত মন্দা দেখা দিয়েছিল। সমাজে জমির চাহিদা বাড়তে থাকে। অর্থনীতি হয়ে পড়ে কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে নগরের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। আবার কৃষির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় সমাজ ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। সমাজে *মহত্তর* বা স্থানীয় প্রধানদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা আগেকার যুগের থেকে কমে এসেছিল। স্থানীয় প্রধানরা এ যুগে শ্রেষ্ঠীদের মতোই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে বঙ্গ এবং সমতটের শাসকরা প্রায় সকলেই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী। বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং শিব পুজোর প্রথা ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলার রাজাদের সমর্থন পায়নি। পরবর্তীকালে (খ্রিস্টীয়

টুকরো কথা

গৌড়বহো (গৌড়বধ)

কনৌজের শাসক যশোবর্মা বা যশোবর্মনের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ ৭২৫-'৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বহো কাব্য রচনা করেছিলেন। যশোবর্মন মগধের রাজাকে পরাজিত করার পর কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় যে, মগধের রাজা বলতে গৌড়ের রাজাকেই বোঝানো হয়েছে।

ছবি : ২.২ শশাঙ্কের মুদ্রা

অষ্টম-নবম শতকে পাল আমলে) বৌদ্ধধর্ম আবার রাজার সমর্থন পেয়েছিল।

শশাঙ্ক কোনো স্থায়ী রাজবংশ তৈরি করে যেতে পারেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের ক্ষমতা নষ্ট হয়। বাংলায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর বছর দশেক পরে হর্ষবর্ধনও মারা যান। বাংলার নানা অংশ প্রথমে কামরূপের রাজা এবং পরে নাগ সম্প্রদায়ের জয়নাগ এবং তিব্বতের শাসকরা অধিকার করেন। অষ্টম শতকে কনৌজ এবং কাশ্মীরের শাসকরা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই বিশৃঙ্খল সময়কে বলা হয় **মাৎস্যন্যায়ের** যুগ।

তোমার চেনা কোনো পশুর ছবি কি ২.২-এর মুদ্রায় দেখতে পাচ্ছ? কেন ঐ পশুর ছবি এই মুদ্রায় আছে বলে মনে হয়?

টুকরো কথা

মাৎস্যন্যায়

মাৎস্যন্যায় বলতে দেশে অরাজকতা বা স্থায়ী রাজার অভাবকে বোঝানো হয়। পুকুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময়ে তেমনি শক্তিশালী লোক দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার করে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একশো বছর ছিল বাংলার ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের যুগ। ঐ যুগে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক ইচ্ছামতো নিজের নিজের এলাকা শাসন করত। বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ছিল না।

বছরের পর বছর এই অবস্থা চলার পরে বাংলার প্রভাবশালী লোকেরা মিলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচন করে (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ সময় থেকে বাংলায় পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

২.৩ বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত

পাল রাজাদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবত বরেন্দ্র অঞ্চলে। পাল শাসনের প্রথম একশো বছর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ) তাদের ক্ষমতা বিস্তারের সময়। এর পরের প্রায় একশো তিরিশ বছর ধরে (খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে দশম শতকের শেষভাগ) পালদের ক্ষমতা কমতে থাকে। আবার, দশম শতকের শেষ দিক থেকে পালদের ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-'৭৪ খ্রিঃ)। বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে তিনি নিজের শাসনের আওতায় এনেছিলেন। গোপালের উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭৪-৮০৬ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (আনুমানিক ৮০৬-'৪৫ খ্রিঃ) উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে অন্তত বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ থেকে পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেবপালের পরে পালদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে। এর কারণ ছিল পালদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল। এ ছাড়া, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার এবং ওড়িশার শাসকরা নবম শতকে বাংলা এবং বিহারের অনেক এলাকা জয় করেছিল। বাংলায় পালদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্য মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আবার, রাজা প্রথম মহীপালের সময় (আনুমানিক ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ) পালশাসনের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

একাদশ শতকের শেষ দিকে রামপাল রাজা হন (আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খ্রিঃ)। কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল পালদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। রামপাল তা উদ্ধার করতে সফল হন। তিনি পালদের ক্ষমতাকে কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলায় পালরাজত্ব কার্যত শেষ হয়ে যায়।

পাল আমলের শাসনব্যবস্থায় সামন্ত নেতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সব সামন্ত নেতাদের পাল আমলের বিবরণীগুলিতে রাজন, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় এরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

টুকরো কথা

পাল রাজাদের তারিখ

মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের জগজ্জীবনপুরে পালযুগের একটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। সেখানে পাওয়া তামার লেখ থেকে জানা গেছে যে দেবপালের পরে তার বড়ো ছেলে মহেন্দ্রপাল রাজা হয়েছিলেন (৮৪৫-'৬০ খ্রিঃ)। আগে ভাবা হতো যে মহেন্দ্রপাল ছিলেন পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশের রাজা। মহেন্দ্রপালের কথা জানার পরে দেবপাল-পরবর্তী পাল রাজাদের শাসন কালের তারিখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে গেছে।

টুকরো কথা

কৈবর্ত বিদ্রোহ

পালশাসনে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল। কৈবর্তরা ছিল সম্ভবত নৌকার মাঝি বা জেলে। সে সময়ে বাংলার উত্তর ভাগে কৈবর্তদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ আছে। এই বিদ্রোহের তিনজন নেতা ছিলেন: দিব্য (দিব্বোক), রুদোক এবং ভীম। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১০৭০-'৭১ খ্রিঃ) দিব্য ছিলেন পালরাষ্ট্রেরই কর্মচারী। পালদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি বিদ্রোহ করেন। মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র দখল করে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এই বিদ্রোহ কত বড়ো আকার ধারণ করেছিল, বা দিব্যর সঙ্গে কতজন সামন্ত যোগ দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় না। মহীপালের ছোটো ভাই রামপাল দিব্যকে দমন করে বরেন্দ্র উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কৈবর্ত রাজা ভীমও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। এ সময়ে পাল রাজাদের শাসন উত্তর বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রামপাল বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন সামন্ত-নায়কদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। তারপর তিনি বরেন্দ্র-সহ বাংলার কামরূপ এবং ওড়িশার একাংশে পাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে রামাবতী নগরে রামপালের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহ পাল শাসনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জানা যায় রামচরিত কাব্য থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে পড়ব।

২.৪ বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল

বাংলার সেন রাজারা খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে শাসন শুরু করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতক শুরু হওয়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সেন শাসন শেষ হয়ে যায়।

সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল, অর্থাৎ মহীশূর এবং তার আশেপাশের এলাকা। সেনরা বংশগতভাবে প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়ে যান। সেন বংশের সামন্তসেন একাদশ শতকের কোনো এক সময়ে কর্ণাট থেকে রাঢ় অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেনের আমলে রাঢ় অঞ্চলে সেনদের কিছুটা আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। হেমন্তসেনের ছেলে বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৬-১১৫৯ খ্রিঃ) রাঢ়, গৌড়, পূর্ব বঙ্গ এবং মিথিলা জয় করে সেন-রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী শাসক বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৯-'৭৯ খ্রিঃ) পাল রাজা গোবিন্দপালকে পরাস্ত করেছিলেন। এভাবে বল্লালসেন পালরাজত্বের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করেন। বল্লালসেন সমাজ-সংস্কার করে রক্ষণশীল, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বল্লালসেনের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৪/৫ খ্রিঃ) প্রয়াগ, বারাণসী এবং পুরীতে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) ছিল ওই আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণ ঘটলে বাংলায় সেন শাসনের কার্যত অবসান ঘটেছিল।

ছক ২.১ : এক নজরে বাংলা ও বিহারে পাল ও সেন রাজাদের শাসন

রাজবংশ	সময়কাল	কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসক	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
পাল	৭৫০–১২০০ খ্রিস্টাব্দ	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল	ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা, শিক্ষা-শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশ, কৈবর্ত বিদ্রোহ
সেন	খ্রিস্টীয় একাদশ শতক–১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ)	বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন	বর্ণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি, তুর্কি অভিযান

লক্ষ করে দেখো যে, পাল রাজাদের শাসনের শেষ দিকেই বাংলায় সেন শাসন শুরু হয়। তার মানে হলো, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বাংলার উপরে আর পাল রাজাদের কর্তৃত্ব তেমন ভাবে ছিল না। কেবল পূর্ব বিহারে এবং উত্তর বাংলায় পাল রাজাদের শাসন টিকে ছিল। এই সুযোগে সেন বংশের সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল শাসনের শেষ দিকে কৈবর্ত বিদ্রোহ সেনদের রাজ্যস্থাপনে সাহয্য করেছিল।

২.৪ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

এতক্ষণ আমরা বাংলার কথা পড়লাম। বাংলার বাইরে খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু নতুন রাজবংশ এবং রাজত্বের উত্থান হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশগুলি স্থানীয় শক্তিশালী

ব্যক্তিদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো জমির মালিক বা যোদ্ধৃনেতাদের অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত, মহাসামন্ত বা মহা-মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হতো। তার বদলে এঁরা রাজা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খাজনা ও উপঢৌকন দিত। এমনকি প্রয়োজনে রাজার ডাকে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে হাজির হতো। কখনও আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে শুরু করেছিল। যেমন, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা কর্ণাটকের চালুক্যশক্তির অধীন ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক রাষ্ট্রকূট নেতা দন্তিদুর্গ চালুক্য শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেই স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। অনেক সময় সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী মানুষেরা পারিবারিক শক্তির সাহায্যে নতুন রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হতো। এইরকম কয়েকটি রাজবংশের কথা এখানে আমরা জানব।

প্রথমে উত্তর ভারত দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল গুর্জর-প্রতিহার। এঁরা রাজস্থান ও গুজরাটের বৃহৎ অঞ্চল শাসন করতেন। এদের মধ্যে রাজা ভোজ (৮৩৬-'৮৫ খ্রিস্টাব্দ) খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি কনৌজ দখল করে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, বহু আক্রমণের মুখে প্রতিহাররা দুর্বল হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজ উত্তরাপথের অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যে কনৌজ নিয়ন্ত্রণ করবে সেই গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে রাখতে পারবে তা বোঝা গিয়েছিল। এই অঞ্চলের নদী-ভিত্তিক বাণিজ্য এবং খনিজ দ্রব্য আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় ছিল। কনৌজ শেষ পর্যন্ত কে দখলে রাখতে পারবে, এই নিয়ে অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে টানা লড়াই চলেছিল। একেই *ত্রি-শক্তি সংগ্রাম* বলা হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে চলা যুদ্ধ-কলহে তিনটি বংশেরই শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে পাল রাজাদের ক্ষমতা কমে গেলে বাংলায় সেন রাজত্ব শুরু হয়েছিল।

২.৬ দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতেও বেশ কিছু আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। পল্লব, পাণ্ড্য এবং বিশেষত চোলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির ব-দ্বীপকে ঘিরে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানকার রাজা মুট্টাবাইয়াকে সরিয়ে বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১ খ্রিঃ) চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর নামে এক নতুন নগরী তৈরি হয় যা চোলদের

টুকরো কথা

রাজপুত্র

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের কথা বারবার বলা হয় তারা হলো রাজপুত। রাজপুত কারা, এদের দেশ কোথায়—এসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হূণদের আক্রমণের পরে বেশ কিছু মধ্য-এশীয় উপজাতির মানুষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাহও হয়। এদের বংশধরদের রাজপুত বলা হয়। তবে রাজপুতরা নিজেদেরকে স্থানীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করত। নিজেদের চন্দ্র, সূর্য বা অগ্নি দেবতার বংশধর বলে মনে করত তারা।

রাজধানী ছিল। বিজয়ালয়ের উত্তরসূরিরা রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করেন। দক্ষিণের পাণ্ড্য এবং উত্তরের পল্লব অঞ্চল চোলদের দখলে আসে। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজরাজ বর্তমান কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল প্রতিপত্তি বাড়ান। তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪ খ্রিঃ) কল্যাণীর চালুক্যশক্তিকে পরাজিত করেন। বাংলার পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গঙ্গা নদীর তীরে পালরাজাকে হারিয়ে তিনি *গঙ্গাইকোণ্ডচোল* উপাধি নেন। প্রথম রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল দুজনেই দক্ষ নৌবাহিনী তৈরি করেন। তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

মানচিত্র : ২.২ : খ্রিস্টীয় নবম শতকের ভারতবর্ষ

২.৭ ইসলাম ও ভারত

এতক্ষণ আমরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু কথা পড়লাম। এই সময়েই ভারতের সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর এই যোগাযোগের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগে আরব উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশই মরুভূমি বা শুকনো ঘাসজমি অঞ্চল। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর। এখানে বৃষ্টিপাত সামান্যই হয়। মক্কা এবং মদিনা এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার যাযাবর মানুষদের বলা হতো বেদুইন। তারা উট পালন করত। খেজুর এবং উটের দুধ ছিল এদের অন্যতম খাদ্য। এই মানুষেরা নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিত।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শুরুতে, কিছু কিছু আরব উপজাতি ব্যবসাকেই প্রধান জীবিকা করেছিল। মক্কা শহর দুটি বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই নগরের দখলদারি নিয়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে নতুন এক ধর্মের জন্ম হলো। তার নাম ইসলাম। ঐ শতকে হজরত মহম্মদ মক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোষণা করেন যে আল্লাহ্ বা ঈশ্বর তাঁকে দূত মনোনীত করেছেন। সে জন্যই মহম্মদকে ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বলা হয়। আল্লাহর বাণী সাধারণ মানুষ মহম্মদের থেকেই জানতে পারেন। ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

বিভিন্ন আরব উপজাতিদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ বন্ধ করার জন্য মহম্মদ একটি বিশ্বাসকেই চালু করেছিলেন। ফলে উপজাতিগুলির মধ্যে ঐক্য তৈরি হতে থাকে। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠিত মক্কাবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণের সাথে মহম্মদের ধর্মীয় মতের যথেষ্ট ফারাক ছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীরা মদিনা শহরে চলে আসেন। মক্কা থেকে মদিনায় এই চলে যাওয়াকে আরবি ভাষায় হিজরত বলা হয়। পরে ঐ সময় থেকে হিসাব করেই *হিজরি* নামেই ইসলামীয় সাল গণনা শুরু হয়। দশ বছরের মধ্যেই মহম্মদ আরব ভূখণ্ডের বিরাট অঞ্চল জয় করেন। মক্কাতেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদ পরলোক গমন করেন। ততদিনে অবশ্য আরবের মূল ভূখণ্ডে ইসলাম ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

ভারত ও আরব সভ্যতা

ভারতের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল তুর্কিরা এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে আরব বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতেন। সিন্ধু মোহনায়, মালাবারে আরবি মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এর থেকে যেমন আরবি বণিকরা লাভবান হয়েছিল, তেমনি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভ করত। শাসকরাও এর থেকে লাভবান হয়েছিল। হিন্দু, জৈন এবং মুসলিম বণিকদের এই বাণিজ্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঐ যুগে বাগদাদের খলিফাদের উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

টুকরো কথা

খলিফা ও খিলাফৎ

মহম্মদের পর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব কে দেবেন— তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহম্মদের প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। এদের বলা হয় *খলিফা*। খলিফা শব্দটা আরবি। তার মানে প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। খলিফাই হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। যেসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি হলো *দার-উল ইসলাম*। খলিফা এই পুরো দার-উল ইসলামের প্রধান নেতা। তাঁর অধিকারের অঞ্চলের নাম *খিলাফৎ*।

৭১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবি মুসলমানরা মহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে সিন্ধু প্রদেশে অভিযান করেন। ইতোমধ্যে আরব ব্যবসায়ী এবং পর্যটকরা খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকেই ভারতে এসেছিলেন। অর্থাৎ, ভারতের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় রাজ্যবিস্তারের আগেই শুরু হয়েছিল।

আরব শক্তি সিন্ধু প্রদেশ, মুলতান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অঞ্চল দখল করে। বিন কাশেমের মৃত্যুর পর তারা ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল থেকে সরে যেতে থাকে। আরবরা নবম শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে অভিযান বন্ধ করে দেয়।

আরবদের পর, আরেক মুসলমান শক্তি তুর্কিরা ভারতের সম্পদের টানে ভারত আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মাহমুদ এবং ঘুরের শাসক মুইজউদ্দিন মহম্মদ বিন সাম (মহম্মদ ঘুরি)—এই দুই তুর্কি শাসক ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয় অভিযানে আসেন। অবশ্য উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল না। গজনির মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরগুলি থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যে তা ব্যয় করা। আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাহমুদ প্রায় সতেরোবার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন।

টুকরো কথা

গজনির সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ ভারতের ইতিহাসে একজন আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি শুধুই একজন যোদ্ধা ছিলেন না। ভারত থেকে তিনি যেমন প্রচুর সম্পদ লুঠ করেছেন, তেমনি নিজের রাজ্যে ভালো কাজে তা ব্যয় করেছেন। তাঁর আমলে রাজধানী গজনি এবং অন্যান্য শহরকে

টুকরো কথা

কোরান ও কাবা

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরান। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে কোরান আল্লাহ্‌র বাণী।

*মক্কায় **মসজিদ-ই হরম** নামে একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদের মাঝখানে **কাবা** নামে একটি পবিত্র ভবন আছে। এরই আরেক নাম **বাইতুল্লাহ**। এই ভবনের এক কোণে কালো রং-এর একটি ছোটো পাথর আছে, যাকে **হাজার উল আসওয়াদ** বলা হয়। কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে থেকেই আরবদের তীর্থক্ষেত্র ছিল কাবা শরীফ। পরবর্তীকালে কাবা শরীফ ইসলামের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।*